স্বাধীনতা ঘোষণার প্রসঙ্গ ও অতিরঞ্জন

বাহ্‌জাদ আহমেদ

বঙ্গবন্ধু, জিয়া ও স্বাধীনতার ঘোষণা শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়েছে, ৩৪ বছর ধরে "স্বাধীনতার ঘোষক" নিয়ে বিতর্ক চলছে-এ কথাটা ঠিক নয়। বিতর্ক শুরু করেছে বিএনপির কিছু মোসাহেব গোছের ব্যক্তি জিয়ার মৃত্যুর পর। জিয়া যেহেতু মোসাহেবি পছন্দ করতেন না, তাই তাঁর জীবদ্দশায় কেউ মিথ্যা বলার সাহস পায়নি এবং জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেনি। আর তাই তো জিয়ার সময় ১৫ খণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হয়েছে নির্ভেজালভাবে, যেখানে জিয়াই স্বীকৃতি দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে (তাঁরই লেখায় ছিল জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি। "একটি জাতির জন্ম" দ্রষ্টব্য)।

২

বিএনপিসহ দক্ষিণপন্থী দলগুলো বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বা স্বাধীনতার ঘোষক বলে স্বীকার করে না-এ কথাটিও ঠিক নয়। বিএনপির জনক জিয়াউর রহমান। তিনিই বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা এবং স্বাধীনতার ঘোষক বলেছেন উদাত্তচিত্তে। তার প্রমাণ সবাই জানে। তিনি লিখেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এবং উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্বাধীনতার দলিল প্রকাশে যেখানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং ঘোষণা নিয়ে কোন বিকৃতি বা অতিরঞ্জিত কিছু সংযোজন করা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা জিয়া সামান্যতমও ক্ষুণ্ন করেননি। জিয়ার আপোসহীন সততার জন্য তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও মিথ্যা বলতে সাহস পাননি। উদাহরণস্বরূপ মীর শওকতের বক্তব্য পরে টানছি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য।

৩

এটা ঠিক, আওয়ামী লীগ জিয়ার ঘোষণাকে পাত্তাই দেয় না। জিয়ার ঘোষণাকে স্বীকৃতি না দিয়ে কোন উপায় নেই। কারণ এটা ঐতিহাসিক সত্য। আমি আওয়ামী লীগকে অনুরোধ করব জিয়ার প্রাপ্য সম্মানটুকু অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি দিতে। এতে করে তারা ছোট না হয়ে বড়ই হবে। কারণ যেখানে বঙ্গবন্ধু জিয়াকে স্নেহ করতেন এবং বীরউত্তম খেতাব প্রদান করেছিলেন, সেখানে আওয়ামী লীগের হীনম্মন্যতা প্রকাশ করা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, জিয়া যখন আর্মির ডেপুটি চীফ ছিলেন, সে সময় তিনি বাকশালের মেম্বার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জিয়াকে বাকশালের মেম্বারশিপ দেয়া হয়। তাছাড়া জিয়ার পরিবারের প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর স্নেহের মানুষকে আওয়ামী লীগ কেন অস্বীকার করবে?

৪

বলা হয় এমএ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। আসলে "বলা হয়" হবে না, এটা বাস্তব সত্য। এমএ হান্নান অবশ্যই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একটি ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। তারিখটা ছিল ২৬ মার্চ এবং সময় ছিল দুপুর ২.৩০ মিনিট। এটা ঠিক যে, এ ঘোষণা খুব কম সংখ্যক মানুষ শুনেছিল। যদিও ঐ দিন ঐ ঘোষণা আরও কয়েকবার পুনর্প্রচার করা হয়। যাঁরা এই ঘোষণা শুনে উজ্জীবিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মীর শওকত একজন; তিনি ১৫ খণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাসে খুব উদাত্তকণ্ঠে ঐ ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অল্প সংখ্যক মানুষ শোনার কারণ হচ্ছে ঐ সময় মানুষ হয় ঢাকা, নয়ত আকাশবাণী বা বিবিসি বেশি শুনছিল দেশের অবস্থা জানার জন্য। তখনও মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার সম্বন্ধে অবগত ছিল, তবে তারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্বন্ধে অবগত হয় আকাশবাণী থেকে ২৬ মার্চ রাতে ও ২৭ মার্চ সকালে। পিটিআইয়ের সংবাদদাতা অনিল ভট্টাচার্যের বরাত দিয়ে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কথা জানানো হয় আকাশবাণীতে এবং ভারতীয় পত্রিকায়। এমনকি ২৬ মার্চের রাতে বিবিসি থেকেও বঙ্গবন্ধুর গোপন বেতার মারফত স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলা হয়। অবশ্য তখনও জিয়া বা তাঁর ঘোষণা সম্বন্ধে মানুষ কিছুই জানত না। কারণ জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে তাঁর প্রথম ঘোষণা পাঠ করেন। এটা ঠিক নয় যে, জিয়ার ঘোষণার বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এবং বিবিসি স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। তবে প্রকৃতপক্ষে পিটিআই এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা প্রথম ঘোষণা পায় বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেই। এ বিষয়ের বক্তব্য আলাদা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করব।

৫

ঐ নিবন্ধে বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ঘোষণা প্রদানের পরিকল্পনা এবং ধরন একটু ভিন্ন হওয়ায় অনেকে এই ঘোষণা হয়ত মিস করেছেন। তাছাড়া ঘোষণার বিষয়ে আগে থেকে কোন প্রচারণা না থাকায়, ঘোষণা কিভাবে দেয়া হবে তা জানা না থাকায় এবং পাক বাহিনীর আক্রমণে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালানোর কারণে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা না শোনাটাই স্বাভাবিক। তবে বঙ্গবন্ধু যে উদ্দেশে ঘোষণা দিতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলো জানুক যে বাংলাদেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও যুদ্ধ ঘোষণা গিয়েছিল পৃথক পৃথকভাবে এবং একাধিক মাধ্যমে। খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করছি এখানে। ইনশাল্লাহ গবেষণাধর্মী লেখাটি প্রকাশ হলে সব জানতে পারবেন। প্রথমেই বলে রাখি, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানীদের সঙ্গে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। তবে তা তাঁর ৬ দফার বাইরে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে কনফেডারেশনে পরিণত করা এবং পরবর্তীতে নিজেরা মিলে স্বাধীনতা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। আর এ লক্ষ্যেই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন ২৫ মার্চ পর্যন্ত। কারণ ইয়াহিয়া খান কথা দিয়েছিল যে, ঐ তারিখের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সন্ধ্যাতেও আশা করেছিলেন ইয়াহিয়া খাঁন একটি এলএফও পাঠাতে যাচ্ছে। তবে তাঁর আশঙ্কাও ছিল যে, পাকিস্তানীরা ক্র্যাকডাউন করতে পারে বাঙালীদের দমাবার জন্য। সে জন্য তিনিও প্রস্তুত ছিলেন। কিভাবে যুদ্ধ শুরু হবে, যুদ্ধে কয়টা সেক্টর থাকবে, কে মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডার হবেন ইত্যাদি (সিদ্দিক সালিকের "উইটনেস টু স্যারেন্ডার" পড়ুন)। আর তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন পাক বাহিনীর আক্রমণের পর-এটাই ছিল তাঁর স্ট্র্যাটেজি; যাতে বিশ্ববাসী বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত না করতে পারে। ক্র্যাকডাউন করে পাকিস্তানীরা সত্যিই ভুল করেছিল এবং ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বঙ্গবন্ধু যে জয় অর্জন করেছিলেন তা অতুলনীয়। আর এ জন্য আজ আমরা স্বাধীন (দয়া করে বলবেন না যে, হঠাৎ এক অপরিচিত মেজরের ডাকে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানীরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে-এতে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে পড়ে)!

এবার ঘোষণার বিষয়টায় আসি। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা এবং মেসেজ গিয়েছে একাধিকবার। বঙ্গবন্ধু মেসেজ আকারে প্রথম যে বক্তব্য দেন সেটাই আসল ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সিনিয়র সহকর্মীরা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, আলোচনা ব্যর্থ হলে পাকিস্তানী জান্তা ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটাতে পারে। ভারতের কাছ থেকেও সে রকম তথ্য ছিল এবং সে জন্য বঙ্গবন্ধুকে ভারত গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে রেখেছিল যে, আক্রান্ত হলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে দিতে হবে (মূলধারা '৭১ দ্রষ্টব্য)। তাই অত্যন্ত গোপন পরিকল্পনা অনুসারে একটি প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বা ঘোষণা তৈরি করা হয়। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দু'চার জন ছাড়া কেউ জানত না। ২৫ মার্চ রাতে যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, ইয়াহিয়া খান বাঙালী জাতিকে ব্লাফ দিয়ে পালিয়েছেন এবং বাঙালী নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন, তখন বঙ্গবন্ধুর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর কি কি ঘটেছিল সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্ল্যান মতো সিনিয়র কর্মীদের ঢাকা ত্যাগ করে ভারত চলে গিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করতে বললেন। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসায় অনেকে তাঁর এই নির্দেশ পেয়েছিলেন, তাঁদের সাথে কথা বললেই হয় (এখন যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের নাম বলে দিচ্ছি, তাঁদের সাথে কথা বলুন-আতাউস সামাদ, খন্দকার মোঃ ইলিয়াস, নায়ীম গওহর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন এবং আরও অনেকে)। এরপর তিনি নায়ীম গওহর এবং মোশাররফ হোসেনের মাধ্যমে টেলিফোনে বার্তা পাঠান চট্টগ্রামে জহুর আহম্মদ ও এমআর সিদ্দিকের কাছে। এই মেসেজে চট্টগ্রাম মুক্ত করে কুমিল্লা পর্যন্ত চলে আসার নির্দেশ ছিল। এরপর ঘটে বাঙালীর ইতিহাসে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বাজানো হয় বলধা গার্ডেন থেকে। তখন ২৫ মার্চের রাত গড়িয়ে ১১.৩০ মিনিট হয়ে গেছে। এই মেসেজটিই হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা যা বাংলাদেশ ডকুমেন্ট হিসেবে ভারতে সংরক্ষিত আছে এবং স্বাধীনতার দলিলে জিয়ার সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা কিভাবে প্রচারিত হয়েছিল তা বলে নিই, যা অনেকে জানেন না বা জানার সুযোগ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর গোপন নির্দেশে বলধা গার্ডেনে একটি হ্যান্ডি ট্রান্সমিটার সেট করা হয় এবং রেডিও পাকিস্তান ঢাকার খুব কাছাকাছি ফ্রিকোয়েন্সিতে তা প্রচার করা হয় যাতে যারা রেডিও পাকিস্তান ঢাকা শুনবে তারা ঐ ঘোষণাও শুনে ফেলবে। বঙ্গবন্ধুর আসল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক যে ব্যক্তিরা ঢাকায় আছেন তাঁরা যেন বিষয়টি জেনে যান। তখন ঢাকায় ছিলেন দি ডেইলি টেলিগ্রাফের ডেভিড লসাক, তিনি এ ঘোষণা শুনেছিলেন এবং তাঁর বই "পাকিস্তান ক্রাইসিস"- এ উল্লেখ করেছেন। এই ঘোষণা অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাসহ টিক্কা খান এবং তার সহকর্মীরাও শুনেছিল (মুসা সাদিক ও রেজাউর রহমানকে জিজ্ঞাসা করুন)। এই ঘোষণার কথা ইয়াহিয়া খান তার পরদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে বলেছিল এবং

পরবর্তীতে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে উল্লেখও করা হয়। আর এই ঘোষণারই মেসেজ ইপিআর পাঠানো শুরু করে মধ্যরাতের পর থেকে, অর্থাৎ তখন ২৬ মার্চ শুরু হয়ে গেছে। বস্তুত ম্যাস পিপল এই ঘোষণা যখন রিসিভ করেছে তখন ২৬ মার্চ –আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ। ঘোষণাটি ছিল এই রকম–দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ, ফ্রম টুডে বাংলা দেশ (আলাদা শব্দ) ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট…। এ ছাড়া ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে যখন জানা গেল পাক বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইপিআর এবং অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করেছে তখনই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ ঘোষণার আর একটি মেসেজ ডিকটেট করেন এবং এটাও ইপিআরের মাধ্যমে পরবর্তীতে পাঠানো হয়। মেসেজটি ছিল এ রকম– পাক আর্মি সাডেনলি এ্যাটাক্ট ইপিআর বেইস এ্যাট পিলখানা এ্যান্ড রাজারবাগপুলিশ লাইন কিলিং সিটিজেন্স… (রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার পড়ুন)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময়ে বেশ ক'টি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে দু'টি ছিল সারাদেশে আর ছোটখাটো ইন্সট্রাকশন আকারে নায়ীম গওহর এবং মোশাররফ হোসেনের মারফত টেলিফোনে চট্টগ্রামে– যার কথা আমি আগে বলেছি। যেহেতু একাধিক মেসেজ চট্টগ্রামে গিয়েছিল চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে এক হাত থেকে আরেক হাতে এবং যেহেতু তখনকার দিনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অত উন্নত ছিল না, তাই স্বাভাবিকভাবে মেসেজের শব্দগুলোর বিন্যাস বা সঠিকতা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। আর তাই জহুর আহমেদের কাছে রক্ষিত মেসেজগুলো বঙ্গবন্ধুর পাঠানো মেসেজ থেকে হয়ত কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এর ফলে আসল ইন্সট্রাকশনের মর্মার্থ বুঝতে কারও এক বিন্দুও অসুবিধা হয়নি। তাই তো স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ লাউডস্পীকারে (মাইকিং করে) এবং এমএ হান্নান স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে দুপুর ২.৩০ মিনিটে প্রথম প্রচার করেন। শুধু তাই নয়, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে জনগণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য প্রচার করেন (কথা বলুন বেলাল মোহাম্মদ, মুসা সাদিক ও আরও অনেকে)। মোদ্দাকথা হলো, বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল এটা বাস্তব সত্য এবং চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিআরের মাধ্যমে মেসেজ চলে যায় এবং মাইকিং করে জনগণকে জানানো হয়। তবুও পত্রিকাটির জন্য কিছু রেফারেন্স দিয়ে রাখছি কোন উদ্ধৃতি ছাড়াই। কারণ এখানে এত কিছু লেখা সম্ভব নয়। দয়া করে পড়ুন ডেভিড লসাকের পাকিস্তান ক্রাইসিস, সিদ্দিক সালিকের উইটনেস টু স্যারেন্ডার, আমেরিকান স্পট রিপোর্ট, পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র, টিক্কা খানের ইন্টারভিউ, রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার, ২৬ ও ২৭ মার্চ ১৯৭১-এ প্রচারিত আকাশবাণী ও বিবিসির খবরের স্ক্রিপ্ট, আরও অনেক আছে। সুতরাং বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি এ কথা আর বলার অবকাশ নেই। ঐ লেখায় প্রশ্ন করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে যে ঘোষণা সত্যায়িত করেছিলেন তা সরকারী দলিলে স্থান পায়নি কেন? এর কোন উত্তর নেই, দলিলে অন্তর্ভুক্ত করলেই হলো। তবে বঙ্গবন্ধুর সত্যায়িত করা ঘোষণাটি আসলে ছিল যুদ্ধ ঘোষণার মেসেজ যা তিনি ড. মাযাহার, তাজউদ্দিন, ওসমানী ও আরও কয়েক জনের সামনে বসে লিখেছিলেন। কিন্তু এই মেসেজ প্রচারিত হওয়ার আগে প্রচারিত হয় প্রি-রেকর্ডেড ঘোষণা যা ভারতসহ বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত আছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই প্রি-রেকর্ডেড মেসেজের উল্লেখ আছে ডেভিড লসাকের পাকিস্তান ক্রাইসিস বইতে। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন এবং কিছু দিন পর লন্ডনে ফিরে বইটি লেখেন। এই বই যখন প্রকাশিত হয় তখনও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। সুতরাং এই বইয়ের তথ্য অন্তত বানোয়াট বলার কোনই অবকাশ নেই (আশ্বস্ত করছি যে, বইটি আমি লন্ডনের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছি)। তবে ২৭ মার্চ ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছিল তা ছিল বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিফলন।

৬

এটা অবশ্যই সঠিক যে, জিয়ার ঘোষণাই মানুষ বেশি শুনেছে এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যে দাবি করা হচ্ছে, তিনিই প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ সবচেয়ে প্রথম ঘোষণা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ যা বলধা গার্ডেন থেকে প্রচারিত হয় ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে– হোক না সেটা খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ শুনেছে। এর পর আসে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ২৬ মার্চ দুপুর ২.৩০ মিনিটে এমএ হান্নানের বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা। শুধু তাই নয়, কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বিপ্লবী ঘোষণা দেন যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন (আপনাদের আশ্বস্ত করছি এই বলে যে, আমার কাছে এই ঘোষণার রেকর্ড আছে)। শুধু তাই নয়, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এও প্রচার করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু তাঁদের সঙ্গে আছেন এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এমন কি জিয়াও তাঁর ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন। এর অর্থ এই যে, বঙ্গবন্ধু ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্ভব ছিল না, আর এ জন্য কৌশল করে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছিল। আর একটা কথা বলে রাখি যে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাত্র ইউনিয়নের কিছু বিপ্লবী কর্মী, চট্টগ্রাম বেতারের কিছু কর্মচারী, কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী এবং আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিএনপির কিছু মোসাহেব এখন দাবি করছেন যে, জিয়া এবং তাঁর সহকর্মীরা এটা প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্বকে জানানোর জন্য– এটা ডাহা মিথ্যা কথা। আসল ঘটনা হচ্ছে, জিয়া এবং তাঁর ফোর্স প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতে পিছিয়ে পটিয়া চলে আসেন। তখন তাঁকে অনুরোধ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাহারা বসানোর জন্য। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা বেলায় জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিদর্শনে এলে বেলাল মোহাম্মদ তাঁকে অনুরোধ করেন, সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে জিয়া যেন একটি ঘোষণা দেন। জিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সাথে একটি ঘোষণা লেখেন এবং তা প্রচার করেন সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে (মমতাজ উদ্দিনও সামনে ছিলেন)। এই ঘোষণার প্রথম লাইন হচ্ছে– আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার দি ইনডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান… (পড়ুন "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"–বেলাল মোহাম্মদ)। এর পর আরও আছে, শুনতে চাইলে লিখুন শুনিয়ে দেব। সত্যি কথা বলতে কি জিয়ার ঘোষণায় অনেক বিদ্রোহী বাঙালী সৈনিক দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভেবে যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে পলিটিক্যাল ওয়ার শুরু হয়েছে তাতে বাঙালী সৈনিকরাও যোগ দিয়েছে।

৭

ঐ নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে যে, তাজউদ্দিন তাঁর প্রথম ভাষণে (১১ এপ্রিল ১৯৭১) জিয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর প্রচারে জিয়ার অবদান স্মরণ করেছিলেন। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে এখানে দু'টি কথা উল্লেখ করতে চাই। তাজউদ্দিন তাঁর ঐ ভাষণে নিশ্চিত করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। আর জিয়ার বরাত দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বরের উল্লেখ করা হয়েছিল এ জন্য যে, জিয়াই প্রথম একটি প্রভিশনাল গবর্নমেন্টের কথা ঘোষণা করেছিলেন, যার বাস্তবতা বা ফাউন্ডেশন থাকুক বা না থাকুক, আর তাই স্বাভাবিকভাবে তা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর একটি প্রভিশনাল সরকারের পক্ষ থেকে, যা তাজউদ্দিন তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন স্ট্র্যাটেজিক বেনিফিটের জন্য। মনে রাখা উচিত, স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা আর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম কণ্ঠস্বর এক কথা নয়।

৮

ঐ লেখা ছাড়াও কিছু ব্যক্তি প্রায়ই উল্লেখ করেন যে, এক দিকভ্রান্ত জাতিকে জিয়া তাঁর ঘোষণার মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুল এবং বানোয়াট। নিঃসন্দেহে জিয়ার ঘোষণা সাধারণ জনগণকে বিশেষ করে বাঙালী সৈনিকদের উজ্জীবীত করেছিল। কিন্তু তা ছিল একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রযোজ্য। কারণ কালুরঘাটের রেডিওর শব্দ বড়জোর ৫০ মাইল দূরত্বে পৌঁছত। পুরো বাংলাদেশ কিন্তু ৫০ মাইলের অনেক বেশি। তবে বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি জিয়ার বিষয়টি তুলে ধরলে দেশের অন্যত্র জনগণ ও সৈনিকেরা আস্বস্ত হয়। অবশ্য জিয়ার ঘোষণার অন্তত ৪০ ঘণ্টা আগেই পুরো বাংলাদেশে প্রচার হয়ে গেছে যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং সাধারণ জনগণ ও বিদ্রোহী সৈনিকেরা প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছে। সুতরাং ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানী আর্মির ক্র্যাকডাউন শুরু হলে সমগ্র জাতি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে– এ কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আসলে যাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণা শোনেননি বা অবগত ছিলেন না তাঁরাই ঐ সময় কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, তখন রাজনৈতিক কর্মীরা কিভাবে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করেছিলেন সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে। এমনকি গাজীপুরের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ভেঙ্গে মেজর শফিউল্লাহ অস্ত্র বিলিয়ে দিয়েছিলেন ২৫ মার্চের আগেই। বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই তাজউদ্দিনকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি নিতে বলেছিলেন এবং ওসমানীকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি আসন্ন যুদ্ধের সেক্টরগুলো কোথায় কোথায় হবে তাও ঠিক করা হয়েছিল অনেক আগেই (উইটনেস টু স্যারেন্ডার, সিদ্দিক সালিক)। তাই তো দেখা গেছে ১৯৭১-এর ৪ এপ্রিল যখন তেলিয়াপাড়ায় ওসমানীর নেতৃত্বে সেক্টর-ওয়াইজ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তখন তাজউদ্দিন ৩ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক শেষ করে ফেলেছেন যুদ্ধ শুরু করার বিষয় নিয়ে। সুতরাং দিক বিভ্রান্তির কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে যাঁরা খাটো করতে চাইছেন তাঁদের খোঁড়া যুক্তি কোন দিনও ধোপে টিকবে না।

৯

আলোচ্য লেখা ধরে এবার আসি অলি আহমেদের উক্তিতে। তাঁর যে উক্তি লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে তা ডাঁহা মিথ্যা। তিনি কি মিথ্যা বলেছেন তা বর্ণনার আগে বলে রাখি, আমি এই ব্যক্তিকে মন থেকে শ্রদ্ধা করতাম এই ভেবে যে তিনি একজন পারসোন্যালিটি সম্পন্ন মানুষ। বিশেষ করে জিয়ার সঙ্গে যখন ছিলেন নিশ্চয়ই অলি আহমেদও জিয়ার মতো সৎ সাহসের হবেন। পাঠকদের জানিয়ে রাখি যে, এই অলি আহমেদ তাঁর অনেক আগের এক লেখায় জিয়াকে "মেজর রিট্রিট" বলে উল্লেখ করেছিলেন, কারণ জিয়া নাকি একাধিক এনকাউন্টারে সাহস করে এগিয়ে যাননি। এই অলি আহমেদই এখন বিএনপির সময় বলছেন স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল "জিয়ার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ" এবং এখানে কোন পলিটিক্যাল প্রসেস ছিল না। শুধু তাই নয়, এ ধরনের একটি থিসিস লিখে তিনি একটা বিস্ময়কর পিএইচডি পেয়েছেন। এ অবস্থায় আমি এখন ভাবছি আমার গবেষণাধর্মী লেখা শেষ হলে আমিও এটা পিএইচডির জন্য সাবমিট করব, যাতে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি জানতে পারে অলি আহমেদ কি ভুয়া থিসিস দিয়ে পিএইচডি পেয়েছেন। তিনি যে উক্তি করেছেন, জিয়া ২৫-২৬ মার্চ রাত ১১টার সময় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। আসল ঘটনা হচ্ছে ২৫ মার্চ রাত ১১টার সময়ও জিয়া ব্যস্ত ছিলেন তাঁর পাকিস্তানী কমান্ডিং অফিসারের আদেশ পালনে, অর্থাৎ পাকিস্তানী জাহাজ সোয়াত হতে অস্ত্র খালাসের জন্য। তাঁকে বরং নিবৃত্ত করেন তাঁর নিম্নস্থ অফিসারবৃন্দ (টেল অব মিলিয়নস পড়ুন)। তিনি প্রকৃতপক্ষে রিভোল্ট করেন রাত ২.৩০ মিনিট যখন ২৬ মার্চ শুরু হয়ে গেছে। আর যদি চট্টগ্রামে প্রথম রিভোল্টের কথা বলা হয় তা করেছিলেন ইপিআরের মেজর রফিক (১৯৭১-এ ক্যাপ্টেন) ২৫ মার্চ রাত ৮.৩০ মিনিটের দিকে। তবে তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ জুড়ে মেজর জিয়ার অনেক আগেই সামরিক বাহিনীর একাধিক অফিসার এবং বেসামরিক যোদ্ধারা পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে রিভোল্ট করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙালী অনেক সিনিয়র অফিসার বঙ্গবন্ধুর সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন তাঁর নির্দেশ পেলেই রিভোল্ট করবেন বলে। দুঃখের বিষয়, সেই অফিসারদের লিস্টে জিয়ার নাম নেই (উইটনেস টু স্যারেন্ডার দ্রষ্টব্য)। আর আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা তো বাদই দিলাম, যদিও এর সঙ্গে অনেক সামরিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা ছিল।

১০

ঐ নিবন্ধ পড়ে মনে হয়েছে, জিয়া প্রথম যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তা ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত বাণী এবং ঐ ঘোষণার সাথে সাথেই বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং সেই বাংলাদেশের অধিপতি হয়ে গেলেন জিয়া স্বয়ং। আর তাই যদি হয় তবে জিয়ার পরবর্তী ঘোষণার তো প্রয়োজন থাকার কথা নয়, তাই কি না? কিন্তু অপরিহার্য বাস্তবতা হচ্ছে, জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রিভাইজড ঘোষণা পড়তে হয়েছিল। কারণ নিজেকে হেড অব দ্য স্টেট বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ঘোষণা দেয়ার কোন লোকাস স্ট্যান্ডি (বৈধ এখতিয়ার) তাঁর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে জিয়া যে প্রথম ঘোষণা দেন তা ছিল তাঁর অপরিপক্বতার বহির্প্রকাশ, অবশ্য কালক্ষেপণ না করে তিনি তা শুধরে নেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে। সুতরাং বাস্তবতা অনুসারে প্রযোজ্য ঘোষণাকেই কাউন্ট করতে হবে এটাই স্বাভাবিক, যদিও তখনকার প্রেক্ষাপটে ঘোষণা কি ছিল সেটা বড় কথা নয়, শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর নামে তা দেয়া হয়েছিল কিনা সেটাই বড় কথা। আর সে কারণেই জিয়া যখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজ দায়িত্বে স্বাধীনতার দলিল সঙ্কলনের উদ্যোগ নেন, তাঁর বৈধ ঘোষণাটিই তিনি এ্যাপ্রুভ করেছিলেন দলিলে অন্তর্ভুক্তির জন্য। ইচ্ছা করলে তিনি তো তাঁর প্রথম ঘোষণা জুড়ে দিতে পারতেন দলিলে, কেউ বাধা দেবার ছিল না। কিন্তু একজন সচেতন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে তিনি তা করেননি। কারণ তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, প্রথম ঘোষণা দাবি করলে লোকাস স্ট্যান্ডির প্রশ্নে তিনি নিজেই অপরিপক্ব ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হবেন এবং তাঁর প্রফেশনাল মিসটেকের রেকর্ড তৈরি হয়ে যাবে ইতিহাসে। জিয়া বরং নিজেকে বাঁচিয়েছেন তাঁর প্রথম ঘোষণা দাবি না করে, যদিও তাঁর অনুসারীরা তাঁকে অপরিপক্ব হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। প্রকৃতপক্ষে জিয়াকে অনুরোধ করা হয়েছিল তিনি যেন সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের উদ্বুদ্ধ করেন জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে, আর এটা করতে গিয়ে তিনি এত ঘটনা ঘটিয়েছিলেন যা কিনা এখন কোরানের আয়াতের মতো স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা হিসেবে দাবি করা হচ্ছে আলগা ফায়দা লোটার জন্য।

১১

আমি এ লেখা শেষ করতে চাই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার বাইরে দু'চারটা ইস্যু দিয়ে। আমি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক নই। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে আমার আগ্রহ প্রবল। তাই স্বাধীনতা এবং বিজয়ের মাসে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রোগ্রাম এবং পত্রপত্রিকার লেখা আগ্রহসহকারে খেয়াল করি।

গত ৭ ডিসেম্বর বিটিভির রাতের প্রোগ্রামে স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর একটি আলোচনা অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছিল। যদিও অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে কিন্তু অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল জিয়ার বন্দনা এবং মিথ্যা কথা বলার প্রতিযোগিতা। অন্য আলোচকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম যে, তিনি এবং অন্য আলোচকরা যার মধ্যে একজন মুখে দাড়ি রেখে ও মাথায় টুপি দিয়ে সবার সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, অনুষ্ঠানটা শুরু করা হলো জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যা কাটছাঁট করে ও নতুন ভয়েস জুড়ে একেবারে লেজেগোবরে অবস্থা করা হয়েছে। একজন স্কুল ছাত্রও বুঝতে পারবে ঘোষণাটা রিমেক করা হয়েছে অপরিপক্ব হাতে এবং বাধ্য হয়ে। বিটিভি এবং মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসহ অন্য বক্তাদের বলে রাখি আমরা ঘোষণার লাইনটা জানি। "আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান"– এই লাইনটা দিয়েই জিয়া তাঁর ঘোষণা শুরু করেছিলেন যার কথা আমি আগেই বলেছি। এরপর আরও আছে, সবই বঙ্গবন্ধুর নামে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীনতার সবকিছু ছিল বঙ্গবন্ধুর নামে বা পক্ষে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের একটাই স্লোগান ছিল– আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে সকলেই এই স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হতো। এমনকি জিয়াও। সমস্ত মুক্তিযুদ্ধই ছিল বঙ্গবন্ধুর নামে এবং দর্শনে (পড়ুন "শেখ মুজিব একটি দর্শন", শাজাহান সিরাজ), এটা অস্বীকার করা মানেই ভণ্ডামি করা।

গত বিজয় দিবসের আরেকটি ঘটনা বলি। এটিএন বাংলায় দেখানো হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র। সেখানে শুরুতে বলা হলো স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল লিডারদের অবদান ছিল তাঁরা হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান। নামগুলো এমনভাবে বলা হলো যে, সবাই এঁরা একই কাতারের। চমৎকার ও সূক্ষ্মভাবে বঙ্গবন্ধুকে ঢালাওভাবে এক কাতারে ফেলে দেয়া হলো এবং এই সুযোগে জিয়াকে পলিটিক্যাল লিডারদের কাতারে দাঁড় করানো হলো, যদিও আর সব লিডারের মতো তিনি কোন দিনই দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দেননি। এর পরের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। বলা হলো, ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানীরা ক্র্যাকডাউন শুরু করলে জিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী অফিসার ও জোয়ানরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার পরের বর্ণনা এমনভাবে দেয়া হলো যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ জিয়ার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা চালিয়ে যায় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। শুধু তাই-ই নয়, বর্ণনার ধরন এমন ছিল যে, নতুন প্রজন্ম বা যারা অবগত নয় তারা মনে করবে জিয়ার নেতৃত্বে বাঙালী সৈন্যদের কাছে পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। এ ধরনের উদ্ভট ও চিত্তসুখের বিষয়ে আমি আগেই বলেছি অলি আহমেদের বিষয়ে বলতে গিয়ে। আমি এটিএন বাংলার এই রূপকথা প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে তর্ক করতে চাই না, কারণ আমি মূর্খের মতো অবাস্তব বিষয় নিয়ে তর্ক করতে আগ্রহী নই। তবে এটা ঠিক যে, বিএনপির কিছু ব্যক্তির মাথা থেকে এই উদ্ভট চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। এর কারণ একটাই। যদি জিয়াকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যমণি বানাতে হয় তবে মুক্তিযুদ্ধকে সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় বলাতে হবে। কারণ জিয়া ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার, কোন পলিটিক্যাল লিডার নয়। কিন্তু কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে দশ-বারো হাজার বাঙালী সৈন্যের পক্ষে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার, যদি না আপামর জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত না করত ভারতের সাহায্য নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধ, যেখানে সোয়া লাখেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর এ যুদ্ধে খাদ্য সাহায্য, অস্ত্রশস্ত্র, ট্রেনিং ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল ভারত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা পলিটিক্যাল ওয়ার। এই পলিটিক্যাল ওয়ারের পলিটিক্যাল পার্টি ছিল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য পার্টি। আর তাই তো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের দ্বারা এ যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল, ভারত ও অন্যান্য দেশ সমর্থন দিয়েছিল এই সরকারকে। ইন্দিরা গান্ধীসহ অন্য নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ করতেন তাজউদ্দিনের সাথে। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের নাম ও ছবি প্রচার করা হতো। পাকিস্তানী বাহিনী যৌথ বাহিনীর (মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্য) প্রধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। স্বাধীনতার পর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পাকিস্তানীরা দুষেছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ বানানোর জন্য (লাস্ট ডেইজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, উইটনেস টু সারেন্ডার, পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র, ইয়াহিয়া খানের ভাষণ, আরও অনেক বিদেশী বই দ্রষ্টব্য)। উপরোল্লিখিত কোন কর্মকাণ্ডে জিয়া বা সশস্ত্র

বাহিনীর কোন অফিসারের নাম নির্দিষ্টভাবে আসেনি। শুধুমাত্র যাঁর নাম এসেছিল তিনি হচ্ছেন ওসমানী সাহেব। তিনিও ছিলেন পাকিস্তানী আমলের রিটায়ার্ড কর্নেল। যাঁকে বঙ্গবন্ধু ডি-ফ্যাক্টো সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান করেছিলেন ১৯৭১-এর মার্চ মাসে আসন্ন স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য। আর তাঁরই আন্ডারে যুদ্ধ করেছিলেন জিয়াসহ অন্যান্য মিলিটারি অফিসার। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, প্রয়োজনের খাতিরেই বাঙালী মিলিটারি অফিসারদের সাহায্য নেয়া হয়েছিল যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য, আর এটাই তো স্বাভাবিক। তাই বলে মহান জনযুদ্ধ হঠাৎ করে দশ-বারো হাজার বাঙালী সৈন্যের যুদ্ধে পরিণত হতে পারে না। আর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে তিনি মুক্তিযুদ্ধের কাল্পনিক সর্বাধিনায়ক হয়ে যেতে পারেন না। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙালী অফিসাররা প্রধানত তিনটি কারণে রিভোল্ট করেছিলেন। এক. পাকিস্তান বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, দুই. দেশপ্রেম এবং তিন. বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে সব বাঙালী অফিসার চাকরি তো হারাতেনই, অনেকের আবার কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড হতো। তাই তাঁরা ভারতের সাহায্য নিয়ে পলিটিক্যাল প্রসেসে যুদ্ধের তাগিদ দিয়েছিলেন ওসমানীকে তেলিয়াপাড়া বৈঠকে। সুতরাং বিএনপিসহ অন্যান্য দলকে বলছি রূপকথার ইতিহাস তৈরি থেকে বিরত থাকুন, কারণ আপনাদের কার্যকলাপে আমরা হো হো করে হাসছি। আর আওয়ামী লীগের প্রতি অনুরোধ রইল জিয়াকে মেনে নিন যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর ঘোষণা সশস্ত্র বাহিনীর অনেক বাঙালী জোয়ানকে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছিল। আবারও ঐ লেখার সূত্র ধরে বলছি বঙ্গবন্ধু অবশ্যই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এই ঘোষণা সারাদেশে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীর উদ্যোগে। যেমন জিয়া করেছিলেন কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে জনগণের অনুরোধে।

আর পরিশেষে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার ও স্থপতি নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর কাতারে দাঁড়াবার কারোরই যোগ্যতা নেই, সে যত বড়ই ব্যারিস্টার বা পিএইচডিধারী হোক না কেন। জিয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। এই বিশ্বাস আমরা যারা নোংরা পলিটিক্স করি না কিন্তু ইতিহাসে আস্থা রাখি তারা মনেপ্রাণে ধারণ করি। সুতরাং জিয়াকে টেনেহিঁচড়ে বঙ্গবন্ধুর কাতারে আনার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন এবং ইতিহাসকে চলতে দিন তার নিজস্ব গতিতে। কারণ আমাদের ইতিহাস আমাদের গৌরব। সেই সাথে আমি অভিভাবকদের মিনতি করছি যে, দয়া করে আপনার সন্তানদের সঠিক ইতিহাস জানান। যেভাবে বাচ্চাদের বই বিকৃত করা হচ্ছে তাতে মুক্তিযুদ্ধের আসল স্পিরিটই থেকে যাচ্ছে আড়ালে। তাই নিরপেক্ষ লেখকদের বই পড়ুন, বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলুন এবং আপনার সন্তানদের সত্য ঘটনাগুলো বলুন যাতে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের মিথ্যাচার থেকে রক্ষা পায়। মনে রাখবেন মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানেই আমাদের সত্তার জলাঞ্জলি দেয়া।

(লেখক একজন পলিটিক্যাল এ্যানালিস্ট। A-ßoAu : truthseeker1971@yahoo.com)

আব্বুবিহীন বইমেলা

স্মিতা আজাদ

একুশের বইমেলা আমাদের বাসার জন্য ছিল একটা উৎসব। উৎসবটা মূলত আব্বুর হলেও, বাসার সবাই আব্বুর এই উৎসবের বিরাট অংশীদার ছিলাম। সে সময় আব্বুকে দেখলে মনে হতো যদি সব আনন্দ আব্বু পৃথিবীর সবার মাঝে বিলিয়েও দেয়, তারপরও আব্বুর আনন্দের ভাণ্ডার পরিপূর্ণই থাকবে।

বইমেলার প্রথম দিন হতে শেষ দিন পর্যন্ত আমার আব্বু প্রতিবাদী লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ থাকতেন বইমেলার মধ্যমণি বা আলোচিত ব্যক্তি। সে সময় সবাই জানত যে বছরের অন্য সব মাসে আব্বুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক, ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে অবশ্যই বইমেলায় পাওয়া যাবে। যেদিন আব্বুর নতুন বই ছাপা হতো সেদিনই তার কয়েকটি কপি আমাদের জন্য নিয়ে আসত। আব্বুর মুখে তখন ছড়িয়ে থাকত আনন্দের আভা। আমাদের মাঝেও তখন সে তার আনন্দের আভা ছড়িয়ে দিত। আব্বু যে শুধু তারই বই বইমেলা থেকে আনত এমন নয়, নতুন বা প্রবীণ যে কোন লেখকের বই-ই সে প্রতিদিন নিয়ে আসত। বইমেলা থেকে বাসায় ফিরে প্রতিদিনই খাবার টেবিলে বইমেলা নিয়ে গল্প করত। তার ভাষায় "আজ কমপক্ষে হলেও... বই বিক্রি হয়েছে। অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে বা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" আরও নানা ধরনের কথা বলে আমাদের মাতিয়ে রাখত।

মোটামুটি প্রতিবছরই বইমেলায় যেতাম। কখনই আমরা আব্বুকে আগে জানাতাম না যে আজ বইমেলায় যেতে পারি। এটা করা হতো যেন তার মুখে বিস্ময়ের আলো দেখতে পারি। মেলা ঢোকামাত্র আমার প্রথম কাজ ছিল "আগামী প্রকাশন" খুঁজে বের করা। খুঁজে পেলে দেখতাম অজস্র মানুষের স্রোত স্টলের সামনে। ভিড় ভেঙ্গে উঁকি দিয়ে ডাকতাম "আব্বু"। অটোগ্রাফ দেয়াতে মগ্ন আব্বু ডাক শুনে মাথা তুলে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাত আর বলত "আরে তুই! অন্যরা কই?" "এই তো এখানে।"– আমার উত্তর। তারপর আব্বু আবার জিজ্ঞাসা করত, "ভিতরে ঢুকবি না বাইরে থাকবি?" "কিছুক্ষণ ঘুরে নিই তারপর ঢুকব।"– আমি উত্তর দিতাম। আব্বু আবার বলত, "সাবধানে চলবি।" ঘোরাঘুরি শেষে আগামী স্টলে গিয়ে আব্বুর পাশে বসলাম। দেখতাম আব্বু সকলের সঙ্গে তার অনুভূতি ব্যক্ত করছে। নানাধরনের আলোচনা, হাসি, তর্ক, সমালোচনা নিয়ে মেতে থাকতে দেখতাম। আজ শুধু আমি আমার স্মৃতির পাতায় রক্ষিত সেই সব স্মৃতি বের করে দেখি আর ভাবি জীবন কত দ্রুত পাল্টিয়ে যায়।" আজ যেন স্মৃতিই আমার কাছে বড় সম্বল। ২০০৪ সালে আমি বইমেলায় একদিনই গিয়েছিলাম তা হল পহেলা ফাল্গুনের দিনে। সেদিন ছিল প্রচণ্ড ভিড়। বইমেলায় গিয়ে সেদিন মনে হয়েছিল যে বইমেলার পরিবেশ আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। "উপরের সব সুন্দরই সুন্দর নয়"– তার প্রমাণ পেলাম ২৭ ফেব্রুয়ারি। মাত্র ১৪ দিনের মাথায় বইমেলার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণার পরিবর্তন ঘটে। যদিও সেদিনের হত্যাপ্রচেষ্টার একটা মামলা করা হয়েছিল যা আজ কোথায় লুকিয়ে আছে তা আমাদের কারও জানা নেই। এর পর কি হয়েছে তা সবার জানা। কত দ্রুত বা কত আকস্মিকভাবে জীবনের ধারার পরিবর্তন ঘটতে পারে তা আমাদের পরিবার আজ একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এবারও ঘুরে এলাম বইমেলায়। প্রথম গেলাম ৭ ফেব্রুয়ারি আর দ্বিতীয়বার গেলাম ২১ ফেব্রুয়ারি। ৭ ফেব্রুয়ারিতে যাওয়ার কারণ হলো আব্বুর নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। তার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে বের হলো এই বইমেলায় "আমার নতুন জন্ম" যার ভূমিকা আম্মুর লেখা। বইটি বের হওয়ার দু'দিন যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম এই বইটি নিয়ে নাকি হুমকি দেয়া হচ্ছে। আবারও অনুধাবন করতে পারলাম "আব্বুর লেখনীশক্তির ক্ষমতা কত।" আর ২১ ফেব্রুয়ারিতে গেলাম বইমেলা দেখতে। এই দু'দিনই বইমেলায় লোকে লোকারণ্য ছিল। কিন্তু তারপরও বইমেলাটিকে ফাঁকা মনে হতে লাগল। আব্বু নেই বলে বইমেলাটিকে খাঁ খাঁ মরুভূমির মতো মনে হতে লাগল। যেন বইমেলাটি কাউকে চাইছে, যার পদচারণা বইমেলার প্রাঙ্গণে আজও লেগে আছে। কিন্তু তাঁর শরীরী উপস্থাপন এ পৃথিবীতে নেই। এত মানুষের মাঝেও নিজেকে নিঃস্ব মনে হতে লাগল। আব্বু আর বইমেলায় আসবে না, নতুন বই লিখবে না, আগামী প্রকাশনীতে বসবে না– এগুলো মনে করতেই খুব কষ্ট পেতে লাগলাম। আমার চোখ দুটি যেন খুঁজতে লাগল বইমেলার মধ্যমণিকে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না আব্বুকে। ছুটে গেলাম "আগামী প্রকাশনী"তে। আজও অন্য বছরের মতো স্টলের সামনে ভিড়। আব্বু যেখানে বসত ঠিক তার বরাবর আজ রয়েছে আব্বুর প্রতিকৃতি। কী নির্মম পরিহাস! এবারও আমি উঁকি দিলাম এবং আব্বু বলেও ডাকলাম তার প্রতিকৃতি দেখে। কিন্তু আজ আমার দিকে সেই বিস্ময়ভরা চোখ তাকায় না। খুব একা মনে হতে লাগল নিজেকে। আব্বুর প্রতিকৃতির দিকে চোখ রাখলাম। হঠাৎ করে মনে হলো প্রতিকৃতিটি যেন আমার সঙ্গে কথা বলছে। যেন আব্বু বলছে, "তুই কেন নিজেকে একা মনে করছিস? আমি আছি না? সব মানুষের শরীরী উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। দেখ, এখন আমিই তো বইমেলাকে প্রতিনিধিত্ব করি। আমি বইমেলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ঘুরে ঘুরে দেখছি। আর যারা আমাকে ভালবাসে তাদের মনে তো আমি চিরদিনই বেঁচে থাকব। আমার বইগুলোর শক্তি আমার চেয়েও বেশি। ভাল করে দেখ, এই বইমেলার প্রতিটি প্রাঙ্গণে আজ শুধু আমিই আর আমিই। ভাল করে দেখ...।"

আমি ভাল করে দেখার আগেই যেন বুঝে ফেললাম বইমেলার প্রতিটি স্থান আজ আব্বুর অতীত পদচারণায় নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করছে। যেন বইমেলা মানেই আব্বু।

[লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের কনিষ্ঠ কন্যা]